ইউনিট

১২ সৈয়দ ও লোদী বংশ (১৪১৪-১৫২৬ খ্রিঃ)

ভূমিকা

১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে তুঘলক বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ শাহের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে তুঘলক বংশের অবসান ঘটে। দিল্লীর আমীরগণের একাংশ দৌলত খান লোদী নামক একজন অমাত্যকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু তাঁর সিংহাসনপ্রাপ্তি সকলের মনঃপুত হয়নি। এই অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে লাহোর ও মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খান দিল্লী দখল করেন (১৪১৪)। ভারত ত্যাগের আগে আমীর তৈমুর এই খিজির খানকে লাহোর, মুলতান ও দিপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। খিজির খান নিজেকে হযরত মুহম্মদ (সা:)-এর বংশধর বলে দাবি করতেন। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ 'সৈয়দ বংশ' নামে পরিচিত। এই বংশ ১৪১৪ থেকে ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করে। ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে আলম শাহ স্বেচ্ছায় বহলুল লোদীকে সিংহাসন ছেড়ে দেন। বহলুল লোদী জাতিতে ছিলেন পাঠান। বস্তুত: তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশই ছিল দিল্লীর সুলতানি আমলে একমাত্র পাঠান বা আফগান বংশ। এই বংশ ১৪৫১ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে। বহলুল লোদীর পুত্র সিকান্দর লোদী ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। চাগতাই বংশীয় বাবুর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে লোদী বংশের শেষ সুলতান ইবরাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লী সালতানাতের পতন ঘটান। এভাবে ১২০৬ থেকে ১৫২৬ পর্যন্ত ৩২০ বছরের দিল্লী সালতানাতের পতন ঘটে। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে বিখ্যাত মুঘলদের আবির্ভাব হয়।

পাঠ ১

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সৈয়দ বংশের পরিচয় দিতে পারবেন।
- সৈয়দ বংশের শাসকদের বর্ণনা দিতে পারবেন।

সৈয়দ বংশের পরিচয়

খিজির খান নিজেকে হযরত মুহম্মদ (সা:) -এর বংশধর বলে দাবি করতেন। এজন্য দিল্লীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ সৈয়দ বংশ নামে পরিচিত

সমরকন্দের আমীর তৈমুর ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত অভিযান করেন। তিনি অপরিমিত সম্পদ ও অগণিত যুদ্ধ বন্দী নিয়ে ভারত ত্যাগ করেন। ভারত ত্যাগের আগে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর খিজির খানকে লাহোর, মুলতান ও দিপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান। তখন থেকে খিজির খান ছিলেন সমরকন্দের অধীনে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তা। তিনি মুলতানে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে তুঘলক বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ শাহের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে তুঘলক বংশের অবসান ঘটে। দিল্লীর আমীরগণের একাংশ দৌলত খান লোদী নামক একজন আমীরকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। কিন্তু তাঁর সিংহাসনপ্রাপ্তির পিছনে সকলের সমর্থন ছিল না। এই অনিশ্চয়তার সুযোগে খিজির খান দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু তিনি সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন নি। তিনি তৈমুরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী শাহরুখের প্রতি অনুগত ছিলেন। সময় সময় তিনি শাহরুখের নিকট উপঢৌকন পাঠাতেন। খিজির খান নিজেকে হযরত মুহম্মদ (সা:) -এর বংশধর বলে দাবি করতেন। এজন্য দিল্লীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ সৈয়দ বংশ নামে পরিচিত।

খিজির খান (১৪১৪-১৪২১ খ্রিঃ)

খিজির খান উদার, ধার্মিক, দয়ালু ও সত্যবাদী হিসেবে সকলের নিকট খ্যাত ছিলেন। তিনি উত্তরাাধিকার সূত্রে সুলতান ছিলেন না। অথচ তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন

খিজির খান যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনেন। তৈমুরের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থদের তিনি অর্থ সাহায্য করেন। তারা আবার চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজে মন দেয়। রোহিলখন্ড, দোয়াব প্রভৃতি অঞ্চল তিনি পুনরায় দিল্লী সালতানাতের অধীনে আনেন। এর ফলে দিল্লী সালতানাত পশ্চিমে মুলতান থেকে পূর্বে জৌনপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বলা যায় খিজির খান দিল্লী সালতানাতের হৃত গৌরব অন্তত: কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর সুশাসনে প্রজারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতো। খিজির খান উদার, ধার্মিক, দয়ালু ও সত্যবাদী হিসেবে সকলের নিকট খ্যাত ছিলেন। তিনি উত্তরাাধিকার সূত্রে সুলতান ছিলেন না। অথচ তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

মোবারক শাহ (১৪২১-৩৪ খ্রিঃ)

খিজির খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মোবারক শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনিও পিতার ন্যায় জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন। তিনি জ্ঞানী-গুণীর সমাদর করতেন। "তারিখ-ই-মোবারক শাহী"-র লেখক ইয়াইয়া বিন-আহমদ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থখানা সুলতানের নামে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থে ইয়াহিয়া বিন-আহমদ সুলতানকে প্রজাবৎসল, ন্যায়বান ও বিনয়ী সুলতান হিসেবে চিত্রিত করেছেন। সারওয়ার-উল-মুলক নামক একজন আমীর ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে মোবারক শাহকে হত্যা করেন।

মুহম্মদ শাহ (১৪৩৪-১৪৪৪ খ্রিঃ)

সুলতান মোবারক শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন যেমনি কোমল তেমনি কঠোর। পূর্ববর্তী সুলতানের ন্যায় তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। তাঁর দরবারে মধ্য এশিয়ার বহু গুণীজনের সমাবেশ ঘটেছিল। প্রত্যহ একটা নির্দিষ্ট সময় তিনি তাঁদের সাহচর্যে কাটাতেন। সুশাসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। সিংহাসনে বসেই তিনি পিতৃব্যের হত্যাকারী সারওয়ার-উল-মুলককে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে সারওয়ার-উল-মুলক পরাজিত হন। তাঁকে হত্যা করা হয়। মুহম্মদ শাহ প্রায় এগার বছর শাসন করেন।

আলম শাহ (১৪৪৪-৫১ খ্রিঃ)

মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন আলম শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির শাসক। তার শাসনামলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আমীরগণ আবার শাসক পরিবর্তনের খেলায় লিপ্ত হন। আলম শাহের প্রধান মন্ত্রী হামিদ খান বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন। তিনি সরহিন্দের শাসনকর্তা বহলুল লোদীকে সিংহাসনে বসার আমন্ত্রণ জানান। বহলুল একদল সৈন্য নিয়ে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। যুদ্ধ করার মতো সাহস বা শক্তি কোনটাই দুর্বল আলম শাহের ছিল না। তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে দেন। বহলুল লোদী দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। এভাবে সৈয়দ বংশের অবসান হয় এবং তদস্থলে লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। আলম শাহ ১৪৪৪ থেকে ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাত বছর রাজত্ব করেন।

সার-সংক্ষেপ

খিজির খান ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের শাসকগণ নিজেদেরকে হযরত মুহম্মদ (সা:)-এর বংশধর বলে দাবি করতেন। খিজির খান ছাড়া এই বংশের অন্যান্য সুলতান ছিলেন মোবারক শাহ, মুহম্মদ শাহ ও আলম শাহ। মোবারক শাহের সময় ঐতিহাসিক ইয়াহিয়া বিন-আহমদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "তারিখ-ই-মোবারক শাহী" প্রণয়ন করেন। এই বংশ ১৪১৪ থেকে ১৪৫১ পর্যন্ত মাত্র সাইত্রিশ বছর শাসন করে। ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে বংশের শেষ সুলতান আলমশাহ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে দেন। দিল্লীতে বহলুল লোদী, লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। খিজির খান তৈমুরের প্রতিনিধি হিসেবে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন–
ক. মুলতানে।
খ. লাহোরে।
গ. দিল্লীতে।
ঘ. দিপালপুরে।

২। ইয়াহিয়া বিন-আহমদ প্রণীত গ্রন্থের নাম–
ক. কিতাব-উল-হিন্দ।
খ. তাবাকাত-ই-নাসিরী।
গ. তারিখ-ই-ফিরোজশাহী।
ঘ. তারিখ-ই-মোবারকশাহী।

৩। মোবারক শাহের পরবর্তী সুলতান ছিলেন–
ক. খিজির খান।
খ. মুহম্মদ শাহ।
গ. আলম শাহ।
ঘ. দৌলত খান।

৪। আলম শাহের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয় তাতে নেতৃত্ব দেন–
ক. দৌলত খান।
খ. বহলুল লোদী।
গ. হামিদ খান।
ঘ. সারওয়ার-উল-মুলক।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. সৈয়দ বংশের পরিচয় দিন।
২. খিজির খান -এর শাসনামল সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৩. মুহম্মদ শাহ সম্পর্কে টীকা লিখুন।
৪. আহমদ শাহ্ -এর শাসনামল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

পাঠ ২

বহলুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- লোদী বংশের পরিচয় দিতে পারবেন।
- কোন পরিস্থিতিতে বহলুল লোদী দিল্লীর সুলতান হন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শাসক হিসেবে বহলুল লোদীর মূল্যায়ন করতে পারবেন।

লোদী বংশের পরিচয়

দিল্লী সালতানাত ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দীন আইবক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদীর পরাজয়ের মাধ্যমে এই সালতানাতের চূড়ান্ত পতন ঘটে। সুদীর্ঘ ৩২০ বছরের শাসনামলে দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে একমাত্র লোদীগণই ছিলেন পাঠান বা আফগান। লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন বহলুল লোদী। বহলুল লোদীর পিতামহ বাহরাম লোদী ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনামলে আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসেন। মুলতানের শাসনকর্তা তাঁকে কাজে নিয়োজিত করেন। নিজ যোগ্যতা বলে শীঘ্রই তিনি উচ্চপদ লাভ করেন। বাহরাম লোদীর পুত্র এবং বহলুল লোদীর পিতা কালা লোদী খোক্করদের বিদ্রোহ দমনে অত্যন্ত কৃতিত্ব দেখান। বহলুলের চাচা সুলতান লোদী খিজির খানের সময় সরহিন্দের শাসনকর্তা ছিলেন। সুলতান লোদীর মৃত্যুর পর বহলুল লোদী চাচার পদে অধিষ্ঠিত হন। বহলুল যখন সরহিন্দের শাসনকর্তা তখন দিল্লীর সুলতান ছিলেন সৈয়দ বংশীয় মুহম্মদ শাহ। মালবের বিদ্রোহ দমনে বহলুল লোদী মুহম্মদ শাহকে সাহায্য করেন। এই কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য সুলতান তাঁকে 'খান-ই-খানান' উপাধি দেন।

বহলুল লোদীর সিংহাসন আরোহণ

মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন আলম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির শাসক। তাঁর দুর্বলতার জন্য শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আমীরগণ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেন। তারা শাসক পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আলম শাহের প্রধানমন্ত্রী হামিদ খান নিজেই এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। বহলুল লোদী এই সময় সাম্রাজ্যের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি তাঁর বীরত্ব ও দক্ষতার জন্য খ্যাত ছিলেন। হামিদ খান তাঁকে সিংহাসন দখল করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বহলুল সসৈন্যে দিল্লীর দিকে রওয়ানা হন। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মত শক্তি ও সাহস কোনটাই আলম খানের ছিল না। তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করেন। বিনা যুদ্ধে বহলুল লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। আলম শাহকে শান্তিতে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। সুলতান বহলুল লোদী ছিলেন সুবিবেচক ও বুদ্ধিমান। ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৮ বছর অত্যন্ত যোগ্যতা ও কৃতিত্বের সাথে তিনি দেশ শাসন করেন। তিনি চক্রান্তকারী হামিদ খানকে বিশ্বাস করা সমীচীন মনে করেন নি। সিংহাসনে বসেই তিনি তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। এতে অপরাপর আমীরগণ সাবধান হয়ে যান। তারা সুলতানের বিরুদ্ধাচরণের আর কোন প্রকার সাহস করেন নি। এই সময় আমীরগণের বেশির ভাগই ছিলেন পাঠান। বহলুল লোদী ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ। তিনি জানতেন যে পাঠানগণ অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। তাই তিনি কোনভাবে তাদের অহংকারে আঘাত করেন নি। তিনি কাজে কর্মে তাদের বুঝিয়ে দেন যে তিনি তাদেরই একজন। তবে তিনি এটাও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন যে তিনি তাদের একজন হলেও তিনিই তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি। আলম শাহের শাসনামলে যারা বিদ্রোহ করেছিল সেই সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের তিনি কঠোরহাতে দমন করেন। অল্প দিনের মধ্যেই দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

সুলতান বহলুল লোদী ছিলেন সুবিবেচক ও বুদ্ধিমান। ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৮ বছর অত্যন্ত যোগ্যতা ও কৃতিত্বের সাথে তিনি দেশ শাসন করেন

জৌনপুরের শর্কী বংশ ছিল খুবই শক্তিশালী। শর্কী বংশীয় শাসককে পরাজিত করে বহলুল লোদী রাজ্যসীমা পূর্ব দিকে বৃদ্ধি করেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বরবক শাহকে জৌনপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বহলুল লোদীর সময় মেওয়াট এবং দোয়াব অঞ্চলের সরদারগণ বিদ্রোহ করেন। তিনি এই বিদ্রোহ অত্যন্ত কঠোরতার সাথে দমন করেন।

বহলুল লোদী একজন ধার্মিক সুলতান ছিলেন

বহলুল লোদী একজন ধার্মিক সুলতান ছিলেন। তিনি ফকির দরবেশদের খুব শ্রদ্ধা করতেন। মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি মুক্তহস্তে দান করতেন। আলেম ও জ্ঞানী-গুণীর সাহচর্য সুলতানের নিকট প্রিয় ছিল। তিনি নিজেও একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন। বহলুল লোদী নিষ্ঠুর ছিলেন না। তিনি অকারণ রক্তপাত পছন্দ করতেন না। আলমশাহ ও হামিদ খানকে হত্যা না করে সেই মধ্য যুগে তিনি যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দেন। ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে এই দক্ষ শাসকের মৃত্যু হয়।

সার-সংক্ষেপ

বহলুল লোদী জাতিতে পাঠান। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে শুধু লোদীগণই পাঠান ছিলেন। সুলতান হওয়ার আগে বহলুল লোদী ছিলেন সরহিন্দের শাসনকর্তা। মালবের বিদ্রোহ দমনে অবদানের জন্য সুলতান মুহম্মদ শাহ তাকে খান-ই-খানান উপাধি দেন। আলম শাহের দুর্বল শাসনের কারণে তিনি ক্ষমতা দখল করেন। এজন্য কোন রক্তপাতের দরকার হয় নি। আলমশাহ স্বেচ্ছায় সুলতানের পদ ত্যাগ করেন। বহলুল লোদী সুলতান হয়ে অল্প দিনের মধ্যে দেশে শান্তি শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বিদ্রোহী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের তিনি দমন করেন। তিনি জৌনপুর জয় করে রাজ্যের বিস্তার ঘটান। তিনি জ্ঞানী-গুণীদের সমাদর করতেন। তিনি দক্ষতার সাথে ৩৮ বছর রাজত্ব করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে পাঠান ছিলেন–
ক. খলজীগণ।
খ. তুঘলকগণ।
গ. লোদীগণ।
ঘ. এঁরা সকলেই।

২। মুহম্মদ শাহ খান-ই-খানান উপাধি দেন–
ক. বহলুল লোদীকে।
খ. বাহরাম লোদীকে।
গ. সুলতান লোদীকে।
ঘ. বৈরাম খানকে।

৩। হামিদ খানের ব্যাপারে বহলুল লোদী সিদ্ধান্ত নেন–
ক. তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল রাখেন।
খ. তাঁকে কারারুদ্ধ করেন।
গ. তাঁকে হত্যার আদেশ দেন।
ঘ. তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দেন।

৪। জৌনপুরে রাজত্ব করত–
ক. খলজী বংশ।
খ. বলবনের বংশ।
গ. তুঘলক বংশ।
ঘ. শর্কী বংশ।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. লোদী বংশের পরিচয় দিন।
২. বহলুল লোদী একজন ধার্মিক সুলতান ছিলেন–মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ৩

সিকান্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সুলতান সিকান্দর লোদীর বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য জয় সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- শাসক হিসেবে সিকান্দর লোদীর মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সুলতান সিকান্দর লোদী

বহলুল লোদীর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নিজাম দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তার মা ছিলেন একজন হিন্দু রমণী। সিংহাসনে বসার সময় তিনি উপাধি গ্রহণ করেন সুলতান সিকান্দর শাহ লোদী। ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২৮ বছর তিনি রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন লোদী বংশের দ্বিতীয় সুলতান।

বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য জয়

সিংহাসনে বসেই সিকান্দর লোদী রাজ্যমধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ছিলেন পিতার মতোই সাহসী ও পরাক্রমশালী। প্রথমেই তাঁকে বড় ভাই বরবক শাহের মোকাবেলা করতে হয়। বহলুল লোদীর আমল থেকেই বরবক শাহ জৌনপুরের শাসনকর্তা ছিলেন। বরবক শাহ সিকান্দর লোদীর শাসন মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি মনে করেন সিংহাসনে উপর তাঁর দাবিই অগ্রগণ্য। এ ব্যাপারে তিনি বেশ কিছু আমীর ও অমাত্যদের সমর্থন লাভ করেন। সিকান্দর শাহ তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করেন। কিছুদিন তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। অবশ্য পরে সুলতান দয়াপরবশ হয়ে তাকে মুক্তি দেন। সিকান্দর লোদী বিদ্রোহী আমীর ও সর্দারদের দমন করতে সক্ষম হন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আফগান দলপতিদের নিয়ন্ত্রণে আনেন। সমগ্র জৌনপুর শাসনাধীনে আনা সিকান্দর শাহর একটা বড় কৃতিত্ব। জৌনপুরের পূর্বাংশ তখনও শর্কী বংশের শাসনাধীনে ছিল। সিকান্দর শাহ ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে শর্কী বংশের শেষ সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ শর্কীকে পরাজিত করেন। পরাজিত হয়ে হোসেন শাহ শর্কী বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সমগ্র জৌনপুর সিকান্দর শাহর দখলে আসে। সিকান্দর শাহ বিহারের একাংশ দখল করেন। অপর দিকে বাংলার সুলতান হোসেন শাহ উত্তর বিহার ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশ দখল করেন। এর ফলে বাংলার সুলতান হোসেন শাহর সাথে সিকান্দর শাহর সংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষের একটি চুক্তি হয়। চুক্তির শর্তানুসারে স্থির হয় যে তাদের কোন পক্ষ অপর পক্ষের রাজ্য আক্রমণ করবে না এবং এক পক্ষ অপর পক্ষের শত্রুর সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখবে না। বিহারের বেশ কিছু এলাকা সিকান্দর শাহর দখলে আসে। তিনি বিজিত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সিকান্দর লোদী ঢোলপুর, চান্দেরী ও গোয়ালিয়রের বিদ্রোহ দমন করেন। মধ্যভারতে বিশৃঙ্খলা চলছিল। সেখানে শান্তি স্থাপনের জন্য সিকান্দর লোদী ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে আগ্রা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দিল্লী থেকে আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রাজধানী শহর হিসেবে আগ্রা নগরীকে তিনি সুন্দরভাবে সাজান। সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর দালান, গোসলখানা ও মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

সিকান্দর লোদী ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে আগ্রা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন

শাসক হিসেবে সিকান্দর লোদী

সিকান্দর শাহ সুশাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। শাসন ব্যবস্থায় তিনি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। তিনি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্বিন্যস্ত করেন। ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের জন্য তিনি জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। জমি জরিপের একক ছিল 'গজ'। জমি জরিপের জন্য যে গজ তিনি নির্ধারণ করেন তা 'সিকান্দরী গজ' নামে পরিচিত। মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক 'ইলাহী গজ' প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এই সিকান্দরী গজই জমি জরিপের একক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সিকান্দর লোদী দেশে পরিপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। দুর্দান্ত আফগানদের তিনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনেন। তিনি প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক হ্রাস করেন। দেশে চুরি ডাকাতি প্রায় ছিল না বললেই চলে। কোতোয়াল শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। শান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে কোতোয়ালকে কঠোর সাজা পেতে হতো। গুপ্তচরগণ দেশের খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করতো। কাজী ছিলেন বিচার বিভাগের প্রধান। বিচার কাজ নিষ্পন্ন করায় কাজী ছিলেন স্বাধীন। সিকান্দর লোদী জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন। ফারসি ভাষায় তাঁর ভালো দখল ছিল। তিনি 'গুলরুখ'

ছদ্মনামে ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। অবসর সময়ে সুলতানের খাস দরবারে কবিতা পাঠের আসর বসতো।

সিকান্দর লোদী ধার্মিক লোক ছিলেন। ইসলামের অনুশাসনগুলো তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। কোন কোন ঐতিহাসিক সিকান্দর লোদীকে হিন্দু বিদ্বেষী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। আসলে তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। ধর্মকে তিনি রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র রাখতেন। তাঁর অধীনে বহু হিন্দু কর্মচারী ছিল। ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের প্রায় সকল কর্মচারীই ছিল হিন্দু। সংগীত শিল্পে সিকান্দর লোদীর অনুরাগ ছিল। ভেষজ শাস্ত্রের কয়েকটি গ্রন্থ তাঁর আদেশে সংস্কৃত থেকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। প্রফেসর আবদুল হালিম শাসক হিসেবে সিকান্দর লোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সিকান্দর লোদী ধার্মিক লোক ছিলেন। ইসলামের অনুশাসনগুলো তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন

সার-সংক্ষেপ

সিকান্দর সাহসী ও পরাক্রমশালী সুলতান ছিলেন। সিংহাসনে বসেই তিনি বড় ভাই বরবক শাহের বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি জৌনপুরের শেষ সুলতান হোসেন শাহ শর্কীকে পরাজিত করে জৌনপুর বিজয় সম্পূর্ণ করেন। বিহারের কিয়দংশ তাঁর দখলে আসে। বাংলার সুলতান হোসেন শাহর সাথে তিনি অনাক্রমণ চুক্তি করেন। ঢোলপুর, চান্দেরী ও গোয়ালিয়রের বিদ্রোহও তিনি দমন করেন। মধ্যভারতে বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য তিনি দিল্লী থেকে আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। সিকান্দর লোদী প্রজাবৎসল নরপতি। জমি জরিপ করে তিনি খাজনা নির্ধারণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য আন্ত:প্রাদেশিক শুল্ক কমিয়ে দেন। দেশে আইনের শাসন কার্যকর ছিল। তিনি গুণীজনের সমাদর করতেন। নিজেও ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। নিজ ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তবে অন্য ধর্মের লোকদের উপর তিনি অবিচার করতেন না। কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁর আদেশে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। পরাজিত হয়ে হোসেনশাহ শর্কী আশ্রয় নেন–
- ক. বাংলায়।
- খ. বিহারে।
- গ. উড়িষ্যায়।
- ঘ. গুজরাটে।

২। সিকান্দর লোদী আগ্রা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন–
- ক. ১৫০১ সালে।
- খ. ১৫০২ সালে।
- গ. ১৫০৩ সালে।
- ঘ. ১৫০৫ সালে।

৩। জমি জরিপের জন্য সিকান্দর লোদীর সময় যে গজের প্রচলন ছিল তার নাম–
- ক. সুলতানি গজ।
- খ. সিকান্দরী গজ।
- গ. ইলাহী গজ।
- ঘ. আসলি গজ।

৪। ছদ্মনামে সিকান্দর লোদী কবিতা রচনা করতেন–
- ক. তোতা-ই-হিন্দ।
- খ. শাহরুখ।
- গ. বুলবুল।
- ঘ. গুলরুখ।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সিকান্দর লোদীর পরিচয় দিন।
২. সিকান্দর লোদীর ক্ষমতাহরোণ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৩. সিকান্দর লোদীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ৪

ইবরাহিম লোদী ও পানিপথের প্রথম যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ইবরাহিম লোদীর শাসনকাল ও শাসননীতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ বর্ণনা করতে পারবেন এবং এর গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

ইবরাহিম লোদীর শাসনকাল ও শাসননীতি

সিকান্দর লোদীর মৃত্যুর পর ইবরাহিম লোদী সুলতান হন। তিনি ছিলেন দিল্লীর লোদী বংশীয় শেষ সুলতান। ১৫১৭ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৯ বছর তিনি শাসন করেন। তাঁর শাসনকাল নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

ইবরাহিম লোদীর সিংহাসন লাভ নিষ্কন্টক ছিল না। আফগান নেতাদের একটি দল তাঁর ছোট ভাই জালাল খানকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করে। ইবরাহিম তাদের পরাজিত করেন। তাঁর আদেশে জালাল খানের শিরচ্ছেদ করা হয়। যে সমস্ত আমীর জালাল খানের সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনকেও মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। ইবরাহিম লোদী সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েন। যাকেই সন্দেহ হতো তাকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া ইবরাহিম লোদী তাঁর কর্তব্য বলে মনে করতে থাকেন। ফলে রাজ্যমধ্যে ভয় এবং আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সুলতানের প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্যে ফাটল ধরে। ইবরাহিম লোদীর সাহসের অভাব ছিল না। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হাতে নিতে তিনি দ্বিধা করতেন না। কিন্তু তাঁর বাস্তব বুদ্ধির অভাব ছিল। আফগানদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহের অনুসৃত নীতি থেকে সরে আসেন। বহলুল এবং সিকান্দর লোদী আফগানদের প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ছিলেন। আফগানগণ যে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও বেপরোয়া এই কথা সব সময় মনে রেখে তাঁরা তাদের সাথে সখ্য ব্যবহার করতেন। আফগানদের সন্তুষ্ট রেখেই পূর্ববর্তী সুলতানদ্বয় তাঁদের উদ্দেশ্য হাসিল করতেন। কিন্তু ইবরাহিম লোদী মনে করতেন শাসন ব্যাপারে সুলতানের স্থান সর্বোচ্চ। তাঁর নির্দেশ বিনাবাক্যে সবাইকে মেনে নিতে হবে। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি নামেমাত্র রাজা থাকতে চাইনা, কাজেও রাজা হতে চাই। গিয়াসউদ্দীন বলবনের মতো তিনি দরবারে পারস্য রীতি প্রবর্তন করেন। দরবারে হাজির হয়ে আমীরদের সুলতানকে কুর্নিশ করতে হতো। এই কাজটি করতে আফগান দলপতিদের ছিল ঘোরতর আপত্তি। এতে তাদের জাত্যাভিমানে আঘাত লাগে। তারা নিজেদের অপমানিত ও অবহেলিত বোধ করতে থাকে। এ থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় তারা খুঁজতে থাকে।

বাবুরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ

পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী ইব্রাহিম লোদীর উপর বিরূপ ছিলেন। সুলতানের চাচা আলম খান লোদী নিজে সিংহাসনে বসতে আগ্রহী ছিলেন। এই দুই প্রভাবশালী আফগান নেতা সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে একমত হন। তাঁরা কাবুলের আমীর বাবুরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহ মনে করেন যে বাবুর ভারত আক্রমণ করে তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুরের ন্যায় ধনরত্ন নিয়ে চলে যাবেন, আফগানগণ দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সেই সুযোগে তিনি ভারতে তাদের রাজত্ব পুনরায় কায়েম করবেন। এই ভাবনা থেকে তিনিও বাবুরের ভারত আক্রমণে সম্মতি দেন। ভারতের উপর বাবুরেরও লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। ভারতীয় রাজণ্যবর্গের অনৈক্য তাঁকে সাহস জোগায়। তিনি উপলব্ধি করেন যে ভারত জয় তাঁর জন্য কষ্টসাধ্য হলেও অসাধ্য হবে না। তাছাড়া তিনি মনে করতেন যে, তৈমুরের উত্তরাধিকারী হিসেবে ভারতের উপর তাঁর দাবি রয়েছে। ভারতের ধনরত্ন লাভের অভিলাষও তাঁর ছিল। তাই আফগান দলপতিদের আমন্ত্রণকে তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ

১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে বাবুর পাঞ্জাব দখল করেন। কিন্তু দৌলত খানের বিরোধিতার জন্য তাঁকে সে বছর কাবুল ফিরে যেতে হয়। ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে তিনি আবার ভারত আক্রমণ করেন। সাথে করে নিয়ে আসেন ১২ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য। তাদের মধ্যে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল। আর ছিল কামান-বন্দুক। ভারতে ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধে কামান-বন্দুকের ব্যবহার হয়নি। তিনি সহজেই পাঞ্জাব দখল করে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। সুলতান তাঁকে বাধা দেয়ার জন্য এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন। দিল্লী থেকে প্রায় ৫৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে পানিপথ প্রান্তরে উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হয়। ১৫২৬ সালের ২১ এপ্রিল এখানে এক প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। এটি পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইবরাহিম লোদী অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। কিন্তু বাবুরের ক্ষিপ্র গতির অশ্বারোহী বাহিনী ও কামানের সামনে ইবরাহিম লোদীর সৈন্যগণ বেশি সময় টিকতে পারে নি। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। বাবুরের আত্মজীবনী অনুসারে ইবরাহিম লোদীর প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হয়। ইবরাহিম লোদী নিজেও যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করেন।

পানি পথের যুদ্ধের গুরুত্ব

যুদ্ধে জয়লাভ করে বাবুর প্রথমে দিল্লী এবং পরে আগ্রা দখল করেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ফলে ক্ষয়িষ্ণু দিল্লী সালতানাতের চূড়ান্ত পতন ঘটে। তদস্থলে আবির্ভাব ঘটে নতুন শক্তির । পানি পথের প্রথম যুদ্ধ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। বাবুর এই যুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম বড় ধরনের ধাপ অতিক্রম করেন। অন্যদিকে ইবরাহিম লোদী ভীরু কিংবা কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি নির্বোধও ছিলেন না। তবে বাস্ত ববুদ্ধির অভাবের কারণে তিনি ব্যর্থ হন। তাঁর ছিল সন্দেহপ্রবণ মন। তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না। আফগানগণ তাঁর প্রতি রুষ্ট ছিল। এজন্য তিনি তাদের স্বাভাবিক আনুগত্য হারান। তাঁর ব্যর্থতার জন্য ইবরাহিম লোদী নিজেই বহুলাংশে দায়ী।

সার-সংক্ষেপ

সিকান্দর লোদীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইব্রাহিম লোদী সুলতান হন। সিংহাসনে বসেই তিনি ছোট ভাই জালাল খান ও তাঁর সমর্থকদের বিদ্রোহ দমন করেন। জালাল খান ও তাঁর কয়েকজন অনুচরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। তিনি দরবারে এমন কিছু রীতি প্রবর্তন করেন যাতে আফগান দলপতিগন ক্ষুব্ধ হন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী এবং সুলতানের চাচা আলম খান লোদী কাবুলের আমীর বাবুরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহেরও এতে সমর্থন ছিল। বাবুর এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথ প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদীর সাথে বাবুরের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বাবুর কামান ব্যবহার করেন। ভারতে এটাই ছিল কামানের প্রথম ব্যবহার। ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হন। যুদ্ধের ফলে দিল্লী সালতানাতের পতন ঘটে। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ইবরাহিম লোদীর ছোট ভাই জালাল খান পরাজিত হওয়ার পর তাঁকে–
ক. শিরচ্ছেদ করা হয়।
খ. কারারুদ্ধ করে রাখা হয়।
গ. ক্ষমা করে দেয়া হয়।
ঘ. নির্বাসিত করা হয়।

২। ইবরাহিম লোদীর শাসনামলে আফগানদের জাত্যাভিমানে আঘাত লাগার কারণ–
ক. ইবরাহিম লোদী সিংহাসনে বসায়।
খ. ইবরাহিম লোদী তাদের কথামত না চলায়।
গ. ইবরাহিম লোদী দরবারে কুর্নিশ প্রথা প্রবর্তন করায়।
ঘ. ইবরাহিম লোদী পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়।

৩। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়–
ক. ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে।
খ. ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে।
গ. ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে।
ঘ. ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে।

৪। ভারতে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করা হয়–
ক. দাইবুলের যুদ্ধে।
খ. ওয়াইহিন্দের যুদ্ধে।
গ. তরাইনের যুদ্ধে।
ঘ. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. ইবরাহীম লোদীর শাসনকাল ও শাসন নীতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. বাবুরকে কেন ভারত আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছেল?

পাঠ ৫

দিল্লী সালতানাতের পতন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- দিল্লী সালতানাতের পতনের প্রত্যেকটি কারণ আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- দিল্লী সালতানাতের পতনের সামগ্রিক কারণ একসাথে বর্ণনা করতে পারবেন।

দিল্লী সালতানাতের পতন

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দন আইবক দিল্লী সালতানাতের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে সুলতান ইবরাহিম লোদীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এই সালতানাতের অবসান ঘটে। দীর্ঘ দিনের অসন্তোষ, অদক্ষতা, অকর্মণ্যতা ইত্যাদি অলক্ষ্যে, ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে দিল্লী সালতানাতের জীবনীশক্তিকে নি:শেষ করে দিচ্ছিল। দিল্লী সালতানাতের এই ক্রমাবনতি ও চূড়ান্ত পতনের পশ্চাতে অনেক কারণ ছিল। কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

শাসকদের দুর্বলতা

৩২০ বছর ব্যাপী দিল্লীর সুলতানি আমলে অনেক সুলতান শাসন করেছেন। এদের মধ্যে ইলতুতমিস, বলবন, আলাউদ্দীন খলজী ও গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ছাড়া আর বাকী প্রায় সকল সুলতানই ছিলেন কোন না কোনভাবে বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের অনুপযুক্ত। শক্তিমান শাসকগণ আমীরদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন। তাদের শাসনামলে দেশে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা বজায় থাকতো। কিন্তু দুর্বল শাসকদের সময় আমীরগণ প্রবল হয়ে পড়তেন, শাসন ব্যবস্থায় শৈথিল্য ও নৈরাজ্য দেখা দিতো। প্রদেশগুলোতে বিদ্রোহ দেখা দিতো। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়তো।

নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতির অভাব

দিল্লীর সুলতানী আমলে উত্তরাধিকারের সুনির্দিষ্ট কোন নীতি ছিল না। কখনো মৃত সুলতানের ভৃত্য, কখনো পুত্র বা কন্যা, কখনো জামাতা, কখনো শ্বশুর আবার কখনোবা ভ্রাতুষ্পুত্র সিংহাসনে বসেছেন। সিংহাসনে বসার প্রশ্নে আমীরগণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাদের সমর্থন না পেলে কেউ সিংহাসনে বসতে পারতেন না, তাদের সমর্থন হারালে কেউ সিংহাসনে থাকতেও পারতেন না।

আমীরগণই ছিলেন 'King makers' এবং 'King breakers'। আমীরগণ আবার সব সময় একমত হতেন না। স্বার্থের দ্বন্দ্বে তাদের মধ্যে ঈর্ষা, কলহ এবং যুদ্ধ পর্যন্ত হতো। অনেক সময় উত্তরাধিকার প্রশ্নের মীমাংসা হতো তরবারি দ্বারাই। এই অনিশ্চয়তা, বিশৃঙ্খলা ও শক্তিক্ষয়ের কারণে রাজ্যের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হতে পারেনি কোন দিনই। সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব দিল্লী সালতানাতের পতনের অন্যতম কারণ।

যোগাযোগের অব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যের বিশালতা

দিল্লীর সুলতানি শাসন প্রায় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আলাউদ্দীন খলজী ও মুহম্মদ বিন তুঘলক প্রত্যক্ষভাবে উত্তর ভারত এবং পরোক্ষভাবে দক্ষিণ ভারত শাসন করতেন। তাঁদের পরবর্তী সুলতানগণ এতোটা না হলেও এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতেন। এই বিশাল সাম্রাজ্যের একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচলের দ্রুত কোন মাধ্যম ছিল না। রাস্তাঘাট ছিল অপ্রতুল। প্রায় গোটা দেশ নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-জঙ্গল দ্বারা আকীর্ণ ছিল। ফলে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত কোন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিলে সে বিদ্রোহের খবর কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছাতো অনেক বিলম্বে। আবার কেন্দ্র যদি বিদ্রোহীদের দমনের জন্য সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতো তাহলে সে সৈন্যদের ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছাতে লেগে যেতো আরও দীর্ঘ সময়। বস্তুত: সুষ্ঠুভাবে দেশ চালানো ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। বিশাল ভারতবর্ষ এক কেন্দ্রের শাসনাধীনে রাখাটাই ছিল অনেকটা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ব্রিটিশ শাসনামলে বিষয়টি সম্ভব হয়েছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য। সুলতানি আমলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত ছিল।

দক্ষ সামরিক বাহিনীর অভাব

সুলতানি আমলে সামরিক বাহিনী দক্ষ ছিল না। আলাউদ্দীন খলজী দক্ষ নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। বিশেষ করে ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় সামরিক বাহিনীতে অতিরিক্ত বদান্যতা দেখানো হয়। এই নীতি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য কল্যাণকর ছিল না। তৈমুর লং কিংবা বাবুরের সুশৃঙ্খল বাহিনীর সামনে দিল্লী বাহিনী দাঁড়াতেই পারেনি।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কেন্দ্রবিমুখ প্রবণতা

ভারতীয় ইতিহাসে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কেন্দ্রবিমুখ প্রবণতা প্রায় সব সময়ই লক্ষ করা যায়। সুযোগ পেলেই প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীন হতে চাইতেন। সাধারণত বাংলা, গুজরাট, মুলতান প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চলের শাসনকর্তাদের মধ্যে এই প্রবণতা ছিল বেশি। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে এই প্রবণতা আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দমন করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় শক্তি আরও দুর্বল হয়ে পড়তো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সুলতানি আমলে বাংলাদেশ দু'শ বছর স্বাধীন ছিল। প্রদেশসমূহের স্বাধীনতাপ্রীতি দিল্লী সালতানাতের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। বাবুর যখন ভারত জয় করেন তখন দিল্লী সালতানাত শুধু ভারতের মধ্য ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পক্ষান্তরে গুজরাট, মালব, রাজপুতনা, বাহমণী রাজ্য, বিজয়নগর রাজ্য, বাংলা প্রভৃতি ছিল একেবারেই স্বাধীন।

মুহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলোর ব্যর্থতা

মুহম্মদ বিন তুঘলকের প্রায় সকল পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়। এই পরিকল্পনাগুলো যতোই যুগান্তকারী কিংবা মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়ে থাকুক না কেন, এগুলোর ব্যর্থতা সাম্রাজ্যের সমূহ ক্ষতি সাধন করে। এগুলোর ব্যর্থতার ফলে সাম্রাজ্য অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক দুর্বলতা প্রশাসনিক ও সামরিক পতনকে ডেকে আনে। দাক্ষিণাত্যে বাহমণী ও বিজয়নগর রাজ্যের পত্তন হয়। বাংলাসহ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান সাম্রাজ্যের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে উল্কার মতো ছুটে বেড়ালেও তিনি সফল হতে পারেন নি।

ফিরোজশাহ তুঘলক ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের দায়িত্ব

দিল্লী সালতানাতের পতনের জন্য ফিরোজশাহ তুঘলকের অতিমাত্রায় উদারতা ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতাও দায়ী ছিল। ফিরোজ শাহ তুঘলক সামন্ত প্রথার উপর ভিত্তি করে সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। জায়গীর প্রথার প্রবর্তন, উত্তরাধিকারসূত্রে সরকারি পদ লাভ, বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাসের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি দিল্লী সালতানাতের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছিল। তুঘলক বংশের শেষ দিকের সুলতানগণ সবাই ছিলেন দুর্বল ও অকর্মণ্য। তারা দিল্লী সালতানাতের পতনের গতি সামাল দিতে পারেন নি। সৈয়দ ও লোদী বংশীয় সুলতানদের আমলে এই পতনের গতি আরও বেগবান হয়। অবশেষে পানিপথের প্রান্তরে দিল্লী সালতানাতের গৌরব রবি অস্তমিত হয়।

হিন্দুদের বিরোধিতা

ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী অমুসলমান। যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দুগণ পরাজিত হলেও তারা একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়েনি। অনেক বড় বড় রাজা-মহারাজা তখনও যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। সাম্রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদে হিন্দুগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা সুলতানী শাসনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই সুযোগ পেলেই তারা বিদ্রোহ করতেন এবং রাজ্যমধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হতো। অব্যাহত শান্তিপূর্ণ শাসন ছিল না বললেই চলে। এই অবস্থা চলতে থাকায় সুলতানদের শাসন জনমনে আস্থার ভাব সৃষ্টি করতে পারে নি। তাই বলা যায় জনসমর্থনের অভাবও দিল্লী সালতানাতের পতনের অন্যতম কারণ।

বৈদেশিক আক্রমণ

শাসকদের দুর্বলতা, আমীরদের দলাদলি ও কলহ, সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব, যোগাযোগের অব্যবস্থা, দক্ষ সামরিক শক্তির অভাব এবং অন্যান্য কারণে তখন দিল্লী সালতানাত এমনিতেই টলটলায়মান ছিল। তদুপরি বারবার ভারতের অভ্যন্তরে বৈদেশিক আক্রমণ ঘটতে থাকে। মোঙ্গলদের আক্রমণ ছিল প্রায় বাৎসরিক ঘটনা। এসকল আক্রমণের মধ্যে বিশেষ করে তৈমুর লং-এর আক্রমণ দিল্লী সালতানাতের জীবনী শক্তি নিঃশেষ করে দেয়। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবুর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে এই ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক অবস্থারই পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে মাত্র।

সার-সংক্ষেপ

দিল্লী সালতানাতের পতনের অনেক কারণ ছিল। শাসকদের দুর্বলতা এই পতনের একটা বড় কারণ। সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতি না থাকায় কোন একজন সুলতানের মৃত্যু হলেই পরবর্তী সুলতান কে হবেন তা নিয়ে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো। আমীরগণ দলাদলি ও হিংসা-রেষারেষিতে লিপ্ত হয়ে পড়তো। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। তুঘলক আমলে অপরিমিত অর্থ ব্যয়ের কারণে রাজ্যমধ্যে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা দেখা দেয়। শাসকদের প্রতি নানাবিধ বিরোধিতার কারণে দিল্লী সালতানাত খুব একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তৈমুর লং ও বাবুরের ভারত আক্রমণ দিল্লী সালতানাতের চূড়ান্ত পতন ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। দিল্লী সালতানাত স্থায়ী হয়েছিল–
ক. ৩০০ বছর।
খ. ৩২০ বছর।
গ. ৩৪০ বছর।
ঘ. ৩৬০ বছর।

২। সুলতানি আমলে অনেক সময় উত্তরাধিকার প্রশ্নের মীমাংসা হতো–
ক. দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমে।
খ. আপোস-মীমাংসার দ্বারা।
গ. সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির দ্বারা।
ঘ. তরবারি দ্বারা।

৩। দিল্লী সালতানাতের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দেয়–
ক. চেঙ্গিস খানের আক্রমণ।
খ. হালাকু খানের আক্রমণ।
গ. তৈমুর লং-এর আক্রমণ।
ঘ. সুলতান মাহমুদের আক্রমণ।

৪। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়–
ক. ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে।
খ. ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে।
গ. ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে।
ঘ. ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. দিল্লী সালতানাতের পতনের কারণগুলো সংক্ষেপে চিহ্নিত করুন।
২. মহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলোর ব্যর্থতা দিল্লী সালতানাতের পতনের জন্য কতটুকু দায়ী?
৩. দিল্লী সালতানাতের পতনের পেছনে হিন্দুদের বিরোধীতা কতটুকু দায়ী?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১২ : রচনামূলক প্রশ্ন

১. সৈয়দ বংশের শাসকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. খিজির খান ও মোবারক শাহের শাসনামল আলোচনা করুন।
৩. কোন পরিস্থিতিতে বহলুল লোদী দিল্লীর সুলতান হন, আলোচনা করুন।
৪. শাসক হিসেবে বহলুল লোদীর মূল্যায়ন করুন।
৫. সিকান্দর লোদীর বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য জয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬. শাসক হিসেবে সিকান্দর লোদীর মূল্যায়ন করুন।
৭. পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কারণগুলো আলোচনা করুন এবং পানিপথের প্রথম যুদ্ধের গুরুত্ব নিরূপণ করুন।
৭. দিল্লী সালতানাতের পতনের জন্য সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব কিভাবে দায়ী ছিল ব্যাখ্যা করুন।
৮. দিল্লী সালতানাতের পতনের কারণগুলো সবিস্তারে লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠ ১২.১ ঃ ১. ক ২. ঘ ৩. খ ৪. গ
পাঠ ১২.২ ঃ ১. গ ২. ক ৩. খ ৪. ঘ
পাঠ ১২.৩ ঃ ১. ক ২. গ ৩. খ ৪. ঘ
পাঠ ১২.৪ ঃ ১. খ ২. গ ৩. ক ৪. ঘ
পাঠ ১২.৫ ঃ ১. খ ২. ঘ ৩. গ ৪. ক